গান্ধর্ব সংগীতের স্বরূপ ও প্রকৃতি

বেদে উল্লিখিত 'দেব' গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বহুবিধ জাতির মধ্যে গন্ধর্বগণ ছিলেন অন্যতম। বেদে এঁদের 'বিদ্বান' এবং 'কেতপুঃ' অর্থাৎ বিজ্ঞান-বিশারদ বলা হয়েছে। গন্ধর্বগণ সর্বপ্রথম অশ্বকে বশ মানায়। তাঁরা কক্ষ বা পাশা খেলায় পটু এবং সংগীতবিদ্যায় অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। বিজ্ঞান-বিশারদ হওয়ার দরুণ তাঁদের পক্ষে সংগীতের নাদ ও ছন্দ নিয়ে পৃথিবীর মধ্যে সর্বপ্রথম পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং সংগীতের বিজ্ঞান-বিষয়ক সূত্র আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছিল। এজন্য আজও ভারতীয় সংগীতের বিজ্ঞান-বিষয়ক গুপ্ত জ্ঞানকে **গান্ধর্ব-বিদ্যা** বলা হয়। গন্ধর্ব আর্যগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হলেও এঁদের একটা নিজস্ব কৃষ্টি, বাসভূমি এবং সাংগীতিক স্বরগ্রাম (গান্ধার-গ্রাম) ছিল।

সর্বপ্রথম স্বর-বিষয়ক পরীক্ষা-নিরীক্ষা কালে গন্ধর্বগুণীরাই ৭টি শুদ্ধ স্বর ৩টি স্বরগ্রাম (ষড়্জগ্রাম, মধ্যমগ্রাম ও গান্ধারগ্রাম), ২২টি শ্রুতি এবং ৩ গ্রামে মোট ২১টি মূর্চ্ছনা আবিষ্কার করেছিলেন। সামগান ও প্রাচীন লৌকিক সংগীতের মিশ্রণ ঘটিয়ে বহুবিধ গান্ধর্বগীতও তাঁরা সৃষ্টি করেছিলেন। গান্ধর্বগীতগুলিকে স্থূলতঃ ২টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—(ক) **ছন্দ-প্রধান** গীত এবং (খ) **সুর-প্রধান** গীত। ছন্দ-প্রধান গীতে প্রাচীন **'জাতি'**র ব্যবহার ছিল এবং সুর-প্রধান গীতে প্রাচীন **'গ্রামরাগ'** ব্যবহৃত হতো।

ছন্দ-প্রধান গান্ধর্বগীতগুলির মধ্যে ব্রহ্মগীত (কম্বলগীত, কপালগীত ইত্যাদি), প্রকরণগীত এবং ধ্রুবা উল্লেখযোগ্য।

ব্রহ্মগীতগুলি কপাল, কম্বল ইত্যাদি নামধেয় প্রাচীন সংগীতজ্ঞানী রচনা করেছিলেন। 'সঙ্গীত-রত্নাকর' (খ্রি. ১৩শ শতক) এবং 'ভরতভাষ্যম্' (খ্রি. ১১শ শতক) গ্রন্থে প্রদত্ত উদাহরণ থেকে বোঝা যায় যে, গীতগুলি আভিচারিক ক্রিয়াকর্মে প্রযুক্ত হতো এবং সেগুলি সম্ভবতঃ আগম-সংগীতের অন্তর্ভুক্ত। ব্রহ্মগীতগুলিতে শুধুমাত্র **৭টি শুদ্ধ জাতি** অর্থাৎ ষাড়্জী, আর্ষভী, গান্ধারী, মধ্যমা, পঞ্চমী, ধৈবতী ও নৈষাদী জাতি ব্যবহৃত হতো। বিকৃত জাতির ব্যবহার নেই। এতে গান্ধর্ব-তাল প্রয়োগ হতো।

প্রকরণগীতগুলি ছিল দু'প্রকার—প্রাচীন ও অর্বাচীন। প্রাচীন প্রকরণগীতগুলি হলো—ঋক্, গাথা, সাম, ছন্দ, পাণিকা, আসারিত ও বর্ধমান। অর্বাচীন প্রকরণগীতগুলির নাম—মদ্রক, অপরান্ত, উল্লোপ্য, প্রকরী, ওবেন, রোবিন্দ ও উত্তর। প্রকরণগীতগুলিতেও ৭টি শুদ্ধ জাতি এবং ১১টি বিকৃত জাতি এবং গান্ধর্ব-তাল ব্যবহৃত হতো।

ছন্দ-প্রধান গান্ধর্বগীতগুলিতে স্থায়ী, অন্তরা ইত্যাদির মত তুক্ ছিল না, ছিল 'বস্তু'। গীতের বস্তুগুলি আবার গান্ধর্ব-তালের বিভাগ অনুযায়ী কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত থাকতো। বৈদিক সামগানের পঞ্চ **'ভক্তি'** এবং 'হিংকার' ও ওঙ্কার নিয়ে ৭টি ভক্তির অনুসরণে ৭টি পর্যন্ত বস্তু থাকতো। চচ্চৎপুট, চাটপুট, ষট্‌পিতাপুত্রক, উদ্‌ঘট্ট ও সংপক্কেষ্টাক—এই পাঁচ প্রকার গান্ধর্বতাল প্রকরণগীতে প্রয়োগ হতো।

পরবর্তীকালে সুরপ্রধান লৌকিক গানগুলির জনপ্রিয়তা সাধারণ লোকসমাজে অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং ছন্দ ও তালপ্রধান গান্ধর্ব গীতগুলির নিয়ম-কঠোরতার জন্য জনপ্রিয়তা হ্রাস পাওয়ায়, গান্ধর্বগুণীগণ প্রাচীন লৌকিক জনপ্রিয় সুরগুলিকে গ্রহণ ও মার্জিত করে সৃষ্টি করেন 'রাগ' নামক কিছু সুরকাঠামো।

এই রাগগুলি গান্ধর্বগুণীদের সৃষ্ট ষড়্জগ্রাম ও মধ্যমগ্রাম নামক দুটি স্বরগ্রামের (Scale) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল বলে এদের প্রাচীন সংগীতশাস্ত্রে 'গ্রামরাগ' বলা হতো। গ্রামরাগগুলির সূক্ষ্ম স্বর-রূপ প্রকাশ করার জন্য ষড়্জগ্রাম ও মধ্যমগ্রামের অন্তর্ভুক্ত ১৪টি **মূর্চ্ছনার** মধ্যে কোনো না কোনোটির সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয়েছিল। গ্রামরাগগুলি যে-সব সুরপ্রধান গান্ধর্বগীতে প্রয়োগ করা হতো সেগুলিকে বলা হতো **'গ্রাম-গীত'**। গ্রামগীতগুলি লৌকিক গীতের অনুসরণে সৃষ্টি করা হয়েছিল। লৌকিক গীতগুলির অঞ্চল ভেদে গীতভঙ্গী বা style পৃথক ছিল। গীতভঙ্গীকে 'গীতি' বলা হতো। অতঃপর গীতভঙ্গী অনুসারে গ্রামগীতগুলি পাঁচ ভাগে বিভক্ত ছিল, যথা—**শুদ্ধা, ভিন্না, গৌড়ী, বেসরা ও সাধারণী** গীতি। এই গীতিগুলিতে স্বর-সঞ্চরণের প্রকৃতি অনুসারে গ্রামরাগগুলিও যুক্ত করা হয়েছিল। শুদ্ধা গীতিতে স্বর সরলগতিতে কাটাকাটাভাবে লাগতো কিংবা কমণীয় মীড়-সহ হতো। গৌড়ী গীতিতে তিন সপ্তকে ভারী এবং নিরবচ্ছিন্ন গমক প্রয়োগ হতো। বেসরা গীতিতে অত্যন্ত দ্রুত এবং নানাবিধ শ্রুতিরঞ্জক স্বরালংকার প্রয়োগ হতো। সাধারণী গীতিতে পূর্বোক্ত চার প্রকার গীতির মিশ্রণ ঘটতো। পরবর্তীকালে, এই গীতগুলি থেকে ধ্রুপদের **'বান'** বা **'বানী'** জন্মেছিল।

প্রাচীনকালে শুদ্ধা, ভিন্না প্রভৃতি পাঁচটি গীতির অন্তর্ভুক্ত মোট ৩০টি গ্রামরাগ ছিল। পরে এই ৩০টি গ্রামরাগের মধ্যে অধিক প্রচলিত কয়েকটি **'জনক রাগ'** হিসেবে গ্রহণ করে তাদের অন্তর্ভুক্ত আরো বহু দেশজ লৌকিক সুর বা ধুনগুলিকে মার্জিত করে **'ভাষারাগ'** রূপে গৃহীত হয়। গ্রামরাগগুলি যেমন গ্রাম ও মূর্চ্ছনার সাহায্যে পরিচিত হতো। ভাষারাগগুলি তেমনি তাদের জনক-গ্রামরাগ ও জনক-গ্রামরাগের স্বরাবলীর মধ্যে যে কোনো একটিকে অংশ ধরে অংশ-স্বরের মূর্চ্ছনার দ্বারা পরিচিত হতো। আবার, যেভাবে গ্রামরাগ থেকে ভাষারাগের পরিচিতি জন্মেছিল ঠিক সেইভাবেই ভাষারাগ থেকে উদ্ভূত হয়েছিল বিভাষা ও অন্তরভাষা রাগ। ভাষা রাগগুলি প্রকাশ করার জন্য ভাষা ও বিভাষা গীতির উদ্ভব হয়েছিল। একমাত্র **বৃহদ্দেশী** গ্রন্থেই (খ্রি. ৫ম শতক) ভাষাগীতি ও বিভাষা গীতির সুস্পষ্ট পরিচয় দেওয়া আছে।

জাতিগানে আলাপ ছিল না, বৈচিত্র্য আনার জন্য এক একটি জাতিতে একাধিক 'অংশ-স্বর' থাকতো। এদের মধ্যে একটি ছিল **মুখ্য-অংশ**, বাকীগুলি ছিল **গৌণ অংশ**। গৌণ-অংশগুলির এক-একটিকে সাময়িকভাবে অংশ-স্বর হিসেবে গ্রহণ করে গানটিকে গাওয়া হতো। আবার মূল বা মুখ্য-অংশ-স্বরে ফিরে আসতে হতো। গ্রাম-রাগের ক্ষেত্রে কিন্তু আলাপ বা **'রাগালাপ'** আবশ্যিক ছিল এবং **প্রত্যেক গ্রামরাগে একটিমাত্র অংশ-স্বরই** থাকতো। ভাষা, বিভাষা, অন্তরভাষা জাতীয় রাগগুলির বেলায়ও আলাপ এবং একটিমাত্র অংশ-স্বর থাকতো এবং এই শ্রেণীর আলাপকে **'রূপ-আলাপ'** বা **'রূপকালাপ'** বলা হতো। গ্রামরাগের রাগালাপে **'তুক'** বা **'ধাতু'** থাকতো না, কেবল আধুনিক **'অওচার'** আলাপের মতো দু-একটি খণ্ডে স্বর-সঞ্চালন করে রাগের **১০টি লক্ষণ** প্রকাশ করা হতো। কিন্তু রূপকালাপের বেলায়—আগে রাগালাপ সম্পূর্ণ করে তারপর কয়েকটি তুক্ বা ধাতুতে (কারণ, ভাষা-বিভাষা-অন্তরভাষা গীতের অবয়ব কয়েকটি তুক্ বা ধাতু দ্বারা গঠিত হতো) বিভক্ত করে আলাপ করা হতো। গ্রামরাগ, ভাষারাগ প্রভৃতিতে আলাপের ক্ষেত্রে সর্বদাই রাগের **আবির্ভাব** থাকতো। কখনোই **তিরোভাব** হতো না।

জাতি এবং গ্রামরাগের ক্ষেত্রে **'জাতি-লক্ষণ'** এবং **'রাগ-লক্ষণ'** তৈরি হয়েছিল প্রাচীন লৌকিক গানগুলির কয়েকটি সাধারণ নিয়ম এবং নাদ-বিজ্ঞানের কতগুলি স্থির নিয়মের ভিত্তিতে। গানের নিয়মের মধ্যে **গ্রহ-স্বর** (গীতের প্রারম্ভিক স্বর), **ন্যাস-স্বর** (গীতের প্রতি তুকের অন্তিম-স্বর), **অপন্যাস-স্বর** (গীতের খণ্ড বা বিভাগের অন্তিম স্বর), **অংশ-স্বর** (মূর্চ্ছনার প্রথম স্বর), **তারত্ব** (সর্বাধিক চড়া স্বর), **মন্দ্রত্ব** (সর্বাধিক নিম্ন-স্বর), **ষাড়বত্ব** (৬ স্বরে রূপান্তর), **ঔড়ুবত্ব** (৫ স্বরে রূপান্তর), **অল্পত্ব** (দুর্বল স্বরের প্রয়োগ) **বহুত্ব** (বলবান স্বরের প্রয়োগ) ইত্যাদি।

গান্ধর্ব গীতের অংশ বিশেষ অর্থাৎ একটি মাত্র তুক্ বা বস্তু বা ধাতু গীতের সমস্ত লক্ষণ অনুসরণ করে প্রাচীন নাট্যের বা নৃত্যনাট্যের নানা পরিস্থিতিতে নাট্যের রস ও বক্তব্যকে পরিস্ফুট করার জন্য প্রয়োগ করা হতো, তাকে বলে 'ধ্রুবা'। ধ্রুবাতে জাতি কিংবা গ্রামরাগ উভয়েরই প্রয়োগ হতো। ছন্দ ও তাল-প্রধান গান্ধর্ব গীত অনুসৃত ধ্রুবাতে 'জাতি', কাব্যাংশে সংস্কৃত নানা ছন্দ অনুযায়ী অক্ষর-বিন্যাস এবং গীত-ভঙ্গিতে লয়ের বৈচিত্র্য ঘটিয়ে, গানের শব্দের হেরফের ঘটিয়ে মাগধী, অর্ধ-মাগধী, সম্ভাবিতা ও পৃথুলা ইতি রীতি প্রয়োগ হতো। সুর-প্রধান গান্ধর্ব গীতে রাগের সুরকাঠামোই ভাবকে ব্যক্ত করতো বলে ছন্দের ক্রিয়া-কৌশলের প্রয়োজন ছিল না। 'ধ্রুবা' যে প্রকারেই হোক না কেন, তা সব সময়েই ছিল নিবন্ধ-গীত এবং নাট্যকার রচিত নয়।